ধ্বনি

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

ইহুদি ও খ্রিস্টানের ধর্মপুথিতে বলে, বিধাতাপুরুষ তাঁর আকাঙ্ক্ষার বলে দৌঃ পৃথিবী, আলো অন্ধকার, সূর্য চন্দ্র সব সৃষ্টি করলেন, এবং সৃষ্টির পর দেখলেন যে সে-সৃষ্টি অতি চমৎকার। ওই পুরাণেই বলে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে তৈরি করেছেন তার প্রতিরূপ করে, আর নিজের নিশ্বাসবায়ুতে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ, মানুষ যেখানে স্রষ্টা তার সৃষ্টির রহস্য বিশ্বসৃষ্টিরহস্যেরই প্রতিচ্ছায়া; অথবা, যা একই কথা, নিজের সৃষ্টির স্বরূপ ছাড়া সৃষ্টিতত্ত্ব-আয়ত্তের আর কোনও চাবি মানুষের হাতে নেই। বাইবেলের বিধাতার মতো মানুষ অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষার চালনায় যা সৃষ্টি করে তার চমৎকারিত্ব তার নিজেকেই বিস্মিত করে দেয়। বাহিরের বিশ্বের স্বরূপ ও সৃষ্টিকৌশল আবিষ্কারে যেমন মানুষের বুদ্ধির বিরাম নেই, নিজের সৃষ্টির স্বরূপ ও কৌশলের জ্ঞানেও তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। কেননা সে-সৃষ্টিও মানুষের বুদ্ধির কাছে বাইরের বিশ্বের মতোই রহস্যময়।

'রামায়ণে' কাব্যের জন্মকথার যে কাব্যেতিহাস আছে, তাতে মানুষের সৃষ্টির এই তত্ত্বই কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব-বিয়োগের শোকে যখন বাল্মীকির মুখ থেকে 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' ইত্যাদি বাক্য আপনি উৎসারিত হল তখন–

তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।
শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া।।

‘বীক্ষণশীল মুনির হৃদয়ে চিন্তার উদয় হল, শকুনির শোকে শোকার্ত হয়ে এই যে আমি উচ্চারণ করলেম।—এ কী!’ তখন নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি এর প্রকৃতি চিন্তা করতে লাগলেন–

চিন্তয়ন্ স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্ মতিম্!

এবং শিষ্যকে বললেন—

পাদবদ্ধোঽস্রক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ। শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥

‘এই বাক্য পাদবদ্ধ, এর প্রতি পদে সমাক্ষর, ছন্দের তন্ত্রীলিয়ে এ আন্দোলিত; আমি শোকার্ত হয়ে একে উচ্চারণ করেছি, এর নাম শ্লোক হোক।’

রামায়ণকার আদিকবির মুখ দিয়ে যে কৌতুহল প্রকাশ করেছেন, সেটি কাব্যরসিক মানবমনের সাধারণ কৌতুহল। মহাকবিদের প্রতিভা এই-যে অপূর্ব মনোহর শব্দগ্রন্থনের সৃষ্টি করে, ‘কিমিদম্’–এ কী বস্তু। এর স্বরূপ কী। তার উত্তরে যে আলোচনার উৎপত্তি, আমাদের দেশের প্রাচীনেরা তার নাম দিয়েছেন অলংকারশাস্ত্র। সে শাস্ত্রের প্রধান কথা কাব্যজিজ্ঞাসা। কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়। কোন গুণে বাক্য ও সন্দর্ভ। কাব্য হয়। আলংকারিকদের ভাষায়, কাব্যের আত্মা কী।

কাব্যের আত্মা যা-ই হোক, ওর শরীর হচ্ছে বাক্য–অর্থযুক্ত পদসমুচ্চয়। সুতরাং কাব্যদর্শনে যাঁরা দেহাত্মবাদী, তাবা বলেন, ওই বাক্য অর্থাৎ শব্দ ও

অর্থ ছাড়া কাব্যের আর স্বতন্ত্র আত্মা নেই। বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই সাজসজ্জার নাম অলংকার। শব্দকে অলংকারে, যেমন অনুপ্রাসে, সাজিয়ে সুন্দর করা যায়, অর্থকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা নানা অলংকারে চারুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের উপাদেয়, সে এই অলংকারের জন্য। কাব্যং গ্রাহ্যামলংকারাৎ।। ' এ মতকে বালকোচিত বলে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এই মত থেকেই কাব্যজিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে অলংকারশাস্ত্র। এবং যেমন অধিকাংশ লোক মতে না হলেও জীবনে লোকায়ত মতের অনুবর্তী, দেহ ছাড়া যে মানুষের আর কিছু আছে তাদের জীবনযাত্রা তার কোনও প্রমাণ দেয় না, তেমনি, মুখের মতামত ছেড়ে যদি অন্তরের কথা ধরা যায়, তবে দেখা যাবে অধিকাংশ কাব্যপাঠক কাব্যবিচারে এই দেহাত্মবাদী। তাদেব কাব্যের আস্বাদন শব্দ ও অর্থের অলংকারের আস্বাদন এবং সেইজন্য অনেক লেখক, যাদের রচনা অলংকৃত বাক্য ছাড়া আর-কিছু নয়, তাঁরা পৃথিবীর সব দেশে কবি পদবি লাভ করেছে।

অলংকারবাদীদের সমালোচনায় অন্য আলংকারিকেরা বলেছেন, কাব্য যে অলংকৃত বাক্য নয়। তার প্রমাণ, শব্দ ও অর্থ দু-রকম অলংকারই আছে অথচ বাক্যটি কাব্য নয়, এর বহু উদাহরণ দেওয়া যায়; আবার সর্বসম্মতিতে যা অতি শ্রেষ্ঠ কাব্য, তার কোনও অলংকার নেই, এরও উদাহরণ আছে। অর্থাৎ সমালোচকদের ন্যায়ের ভাষায় কাব্যোব ও-সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দুই দোষেই দুষ্ট। যেমন 'সাহিত্যদর্পণ'-এর একজন টীকাকার উদাহরণ দিয়েছেন–

তরঙ্গনিকরোন্নীততরুণীগণসংকুলা।
সরিদ্ বহতি কল্লোলব্যুহব্যাহতভীবভুঃ ॥

এ বাক্যের শব্দে ও অর্থে অনুপ্রাস ও রূপক অলংকার রয়েছে, কিন্তু একে কেউ কাব্য বলবে না। বাক্য অনলংকৃত অথচ শ্রেষ্ঠ কাব্য, এর উদাহরণে সাহিত্যদর্পণকার কুমারসম্ভবের অকালবসন্ত-বর্ণনা থেকে তুলেছেন–

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥

এর এখানে-ওখানে যে একটু অনুপ্রাসের আমেজ আছে, তরঙ্গ-নিকর্যোয়ীত-তরুণীগণের কাছে তা দাড়াতেই পারে না, আর এর অর্থ একেবারে নিরলংকার। অকালবসন্তের উদ্দীপনায় যৌবনরাগে রক্ত বনস্থলীতে রতিদ্বিতীয় মদনের সমাগমে তির্যকপ্রাণীদের অনুরাগের লীলাটি মাত্র কালিদাস ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাকে কোনও অলংকারে সাজাননি। অথচ মনোহারিত্বে পাঠকের মনকে এ লুঠ করে নেয়। অলংকারবাদীরা বলবেন, এখানেও অলংকার রয়েছে–যার নাম স্বভাবোক্তি অলংকার। প্রতিপক্ষ উত্তরে বলবেন, ওই নামেই প্রমাণ–অলংকার ছাড়াও কাব্য হয়। কারণ, যেখানে ক্রিয়া ও রূপের অকৃত্রিম বর্ণনাই কাব্য, সেখানে নেহাত মতের খাতিরে ছাড়া সেই বর্ণনাকেই আবার অলংকার বলা চলে না।

অলংকারবাদকে একটু শুধরে নিয়ে আর-এক দল আলংকারিক বলেন, অলংকৃত বাক্য মাত্রেই যে কাব্য নয়, আর নিরলংকার বাক্যও কাব্য হতে পারে, তার কারণ কাব্যের আত্মা হচ্ছে ‘রাতি’। রীতিরাত্মা কাব্যস্য। ‘রীতি’ হল পদরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি। বিশিষ্ট পদরচনা রীতিঃ।’ অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল ‘সটাইল’। স্টাইলের গুণেই বাক্য বা সন্দর্ভ কাব্য হয়, আর তার অভাবে বক্তব্য বিষয়ের সমতা থাকলেও অন্য বাক্য কাব্য হয় না। স্বীকার করতে হবে, পৃথিবীর অনেক কবির কাব্য এই গুণেই লোকরঞ্জক হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ তাঁর স্টাইল। ইউরোপের অনেক আধুনিক পদ্য ও গদ্য-লেখক এই স্টাইলের গুণে বা নবীনত্বে আর্টিস্ট বা কবি নাম পেয়েছেন। অলংকার হচ্ছে এই স্টাইল বা রীতির আনুষঙ্গিক বস্তু। অঙ্গে অলংকার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখায় না, যদি না তার অবয়বসংস্থান নির্দোষ হয়। স্টাইল হচ্ছে কাব্যের সেই অবয়বসংস্থান।

রীতিবাদের দোষ দেখিয়ে অন্য আলংকারিকেরা বলেন, নির্দোষ অবয়বে ভূষণ যোগ করলেই সৌন্দর্য আসে না, শরীরেও নয় কাব্যেও নয়।

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিবিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥

‘রমণীদেহের লাবণ্য যেমন অবয়বসংস্থানের অতিরিক্ত অন্য জিনিস, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে যা শব্দ, অর্থ, রচনাভঙ্গি, এ সবার অতিরিক্ত আরও কিছু।’ এই ‘অতিরিক্তবস্তুই কাব্যের আত্মা।

এ বিস্তু’ কী। উত্তরে বস্তুবাদী আলংকারিকেরা বলেন, এ জিনিসটি হচ্ছে কাব্যের বাচ্য বা বক্তব্য। ‘তরঙ্গনিক রোমীত’ ইত্যাদি যে কাব্য নয়। তার কারণ, ওর বাচ্য কিছুই নয়, ওর বক্তব্য বিষয় অকিঞ্চিৎকর। অন্য বাক্যের মতো কাব্যও পদসমুচ্চয় দিয়ে, শব্দের সঙ্গে শব্দ সাজিয়ে, কোনও বস্তু বা ভাবকে প্রকাশ করে। কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে ওই বস্তু বা ভাবের বিশিষ্টতার উপর। সব বস্তু কি সব ভাব কাব্যের বিষয় নয়। বিশেষ বিশেষ প্রকারের বস্তু ও বিশেষ বিশেষ রকমের ভাবকে প্রকাশ করলেই তবে বাক্য কাব্য হয়। যেমন, ভাব কি বস্তুর মনোহারিত্ব, চমৎকারিত্ব বা অভিনবত্ব বাক্যকে কাব্য করে। অনেক বস্তু আছে যা স্বভাবতই মনোহারী– চন্দ্রচন্দনকোকিলালাপভ্রমরাঝংকারাদয়ঃ। অনেক ভাব, যেমন–প্রেম, করুণা,

বীর্য, মহত্ত্ব, মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। কবিরা এইসব বিশিষ্ট ভাব ও বস্তুকে কাব্যে প্রকাশ করেন; এবং তাদের বিশিষ্ট পদরচনাভঙ্গি, শব্দ ও অর্থে যথোচিত অলংকারের সমাবেশ, তাদের বাচ্য ভাব ও বস্তুকে অধিকতর মনোজ্ঞ করে তোলে। ভাব, বস্তু, রীতি ও অলংকার, এদের যথাযথ সমবায়েই কাব্যের সৃষ্টি। এ-সবার অতিরিক্ত কাব্যের আত্মা বলে আর ধর্মান্তর নেই। যেমন বার্হস্পত্যেরা বলেছেন–রক্ত, মাংস, মজ্জা ইত্যাদি উপাদানের সংমিশ্রণেই মানবদেহে চেতনার আবির্ভাব হয়; মন নামে কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নেই।

যে-সব আলংকারিক বস্তুবাদীদের মতে মত দিতে পারেননি, তাদেরও স্বীকার করতে হয়েছে, অধিকাংশ কবির কাব্য এই ভাব, বস্তু, রীতি ও অলংকারের গুণেই কাব্য। এমনকী, মহাকবিদের কাব্যপ্রবন্ধেরও অনেকাংশে এ ছাড়া আর কিছু নেই। তবে তাদের ভাব ও বস্তুর চমৎকারিত্ব হয়তো বেশি, তাদের রচনা ও প্রকাশভঙ্গি আরও বিচিত্র, তাদের অলংকার অধিকতর সংগত ও শোভন। কিন্তু তবুও যে এই আলংকারিকেরা কাব্যবিচারে এখানেই থামতে পারেননি, তার কারণ, তাঁরা দেখেছেন, যা শ্রেষ্ঠ কাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচাকে ছাড়িয়ে যাওয়া। শব্দার্থমাত্রে যেটুকু প্রকাশ হয়, সেই কথাবস্তু কাব্যের প্রধান কথা নয়। তা যদি হত, তবে যার শব্দার্থের জ্ঞান আছে, তারই কাব্যের আস্বাদন হত, কিন্তু তা হয় না।

শকদার্থশাসন জ্ঞানমাত্রেণৈব ন বেদ্যতে।
বেদ্যতে সাহি কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম।।

‘কাব্যের যা সার অর্থ, কেবল শব্দার্থের জ্ঞানে তার জ্ঞান হয় না, একমাত্র কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞেরাই সে অর্থ জানতে পারেন।’

যদি চ বাচ্যরূপ এবাসাব্যর্থঃ স্যাৎ তদ্বাচ্য-বাচক-স্বরূপপরিজ্ঞানাদেব তৎপ্রতীতিঃ স্যাৎ।

‘কাব্যার্থ যদি কেবল বাচ্যরূপ হত, তবে বাচ্যবাচকের স্বরূপজ্ঞানেই কাব্যার্থের প্রতীতি হত।’

অথচ বাচ্যবাচকরুত্বপলক্ষণকৃতশ্রমাণাং কাব্যতত্ত্বার্থভাবনাবিমুখীনাং স্বরাশ্রত্যাদি লক্ষণমিবাপ্রগীতানাং গান্ধর্বলক্ষণবিদ্যামগোচর এবাসাব্যর্থঃ।

‘অথচ দেখা যায়, কেবল বাচ্যবাচক-লক্ষণের জ্ঞানলাভেই যাঁরা শ্রম করেছে, কিন্তু বাচ্যাতিরিক্ত কাব্যতত্ত্বের আস্বাদনে বিমুখ, প্রকৃত কাব্যার্থ তাদের অগোচর থাকে; যেমন গানের লক্ষণমাত্র যাঁরা জানে তাদেরই সংগীতের সুর ও শ্রুতির অনুভূতি হয় না।’ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কাব্য নিজের বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে। আলংকারিকেরা কাব্যের এই বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মান্তরের অভিব্যঞ্জনার নাম দিয়েছেন ‘ধ্বনি’।

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সুরিভিঃ কথিতঃ ॥

‘যেখানে, কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই ‘ধ্বনি’ বলেছেন।’ এই ব্যঞ্জিত অর্থের আলংকারিক পরিভাষা হল ‘ব্যঙ্গ্য’ বা ‘ব্যঙ্গ্যার্থ’। ধ্বনিবাদীরা বলেন, এই ধ্বনি বা ‘ব্যঙ্গ্য’ হচ্ছে কাব্যের আত্মা, তার সারতাম বস্তু।

কিন্তু গোড়াতেই তাঁরা সাবধান করেছেন যে, কাব্যের ‘ধ্বনি, উপমা ও অনুপ্রাস প্রভৃতি সে-সব অলংকার তার বাচ্যবাচকের— অর্থ ও শব্দের– চারুত্ব সম্পাদন করে, তাদের চেয়ে পৃথক জিনিস।

বাচ্যবাচকচারুত্বহেতুভ্য উপমাদিভ্যোহনুপ্রাসাদিভ্যশ্চ বিভক্ত এব।’

কারণ, শ্রেষ্ঠ কবিরা এমন সুকৌশলে, এ-সব অলংকারের প্রয়োগ করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ওই অলংকার বুঝি কবিতাকে বাচার্থ ছাড়িয়ে ধ্বনিতে নিয়ে গেল। কিন্তু কাব্যরসিকেরা জানেন, শ্রেষ্ঠ কাব্যের আত্মা যে ‘ধ্বনি।’ তা সেখানে নেই। কারণ, সেখানেও বাচাই প্রধান; ধ্বনির আভাস যেটুকু আছে, তা বাচার্থের অনুযায়ী মাত্র। কিন্তু, শ্রেষ্ঠ কাব্যের যে ‘ধ্বনি’, তাই তার প্রধান বস্তু।

ব্যঙ্গস্য যাত্রাপ্রাধান্যং বাচ্যমাত্রানুযায়িনঃ।
সমাসেক্ত্যাদয়স্তত্র বাচালংকৃতয়ঃ স্ফুটাঃ॥
ব্যঙ্গ্যস্য প্রতিভামাত্রে বাচার্থানুগমেহপি বা।
ন ধ্বনির্যত্র বা তস্য প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে।
তৎপরাবেব শব্দার্থৌ যাত্র ব্যঙ্গ্যং প্রতি স্থিতৌ।
ধ্বনেঃ স এব বিষয়ো মন্তব্যঃ সংকরোঙ্খিতঃ ॥

‘ব্যঙ্গ্য যেখানে অপ্রধান এবং বাচার্থের অনুযায়ী মাত্র, যেমন সমাসোক্তিতে, সেখানে সেটি স্পষ্টই কেবল বাচালংকার, ধ্বনি নয়। ব্যঙ্গা আভাসমাত্রে থাকলে, অথবা বাচ্যার্থের অনুগামী হলে তাকে ধ্বনি বলে না; কারণ, ধ্বনির প্রাধান্য সেখানে প্রতীয়মান নয়। যেখানে শব্দ ও অর্থ ব্যঙ্গাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই হচ্ছে ধ্বনির বিষয়; সুতরাং সংকরালংকার আর ধ্বনি এক নয়। ’

এখানে যে দুটি অলংকারের বিশেষ করে নামোল্লেখ আছে, তার মধ্যে সমাসোক্তি ংকারে বর্ণিত-বস্তুতে অন্য বস্তুর ব্যবহার আরোপ করে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু ওই ভিন্ন বস্তু বা তার ব্যবহারের স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকে না; বর্ণিত-বস্তুর কার্যবর্ণনা বা বিশেষণের মধ্যেই এমন ইঙ্গিত থাকে, যা তাদের সূচিত করে। এতে শব্দের প্রয়োগ খুব সংক্ষেপ হয় বলে এর নাম সমাসোক্তি। আনন্দবর্ধন খুব একটা জমকালো। উদাহরণ তুলেছেন–

উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া পুরোহপি রাগাদ গলিতং ন লক্ষিতম।

‘উপগত সন্ধ্যারাগে আকাশে যখন তাবকা অস্থিরদর্শন, সেই নিশার প্রারম্ভে যেমন চন্দ্রোদয় হল, অমনি পূর্ব দিকের সমস্ত তিমির যবনিকা কখন যে রশ্মিরাগে অপসৃত হল তা লক্ষ্যই হল না।’ এখানে রাত্রি ও চন্দ্রে, নায়িকা ও নায়কের ব্যবহার আরোপ করে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং রচনায় শিল্পকৌশলের চতুর্য যথেষ্ট। ওর প্রতি শব্দটি শ্লিষ্ট; রাত্রি ও চন্দ্রের কথাও বলছে, আবার নায়িকা ও নায়কের ব্যবহারও ইঙ্গিত করছে; উপোঢ় রাগেণ বিলোলতারকং–সন্ধ্যার অরুণিমা আকাশের তাঁরা অস্থিরদর্শন, আবার উপচিত অনুরাগে চঞ্চল চক্ষুতারকা। গৃহীতং শশিনা নিশামুখম— চন্দ্রোদয়ে আভাসিত রাত্রির প্রারম্ভ আবার মুখ অর্থে বদন, গৃহীত মানে ধৃত পরিচুম্বিত। সমস্তং তিমিরাংশুকং-এর ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট; কিন্তু একটু কারিকুরি আছে। অংশুক মানে শুধু কাপড় নয়, সূক্ষ্ম বস্ত্র–যা নায়িকোচিত, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারও গাঢ় নয়–পাতলা অন্ধকার। পুরঃ–অর্থ পূর্ব দিক, আবার সম্মুখে। রাগাদ গলিতং— আলোকরাগে অপসৃত, আবার অনুরাগের আবেশে স্খলিত। ন লক্ষিতং— রাত্রির প্রারম্ভ লক্ষিত হল না, আবার অনুরাগের আবেশে অজ্ঞাতেই নীলাংশুক স্খলিত হল। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আনন্দবর্ধন বলছেন–

এখানে ধ্বনি নেই, কেনন। এখানে ব্যাচাই প্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থ তার অনুগামী মাত্র–ইত্যাদীে ব্যঙ্গ্যেনানুগতং বাচ্যমেব প্রাধান্যেন প্রতীয়তে। রাত্রি ও চন্দ্রে নায়িকানায়কের ব্যবহার সমারোপিত হয়েছে, এই বাক্যার্থ ছাড়িয়ে এ কবিতা আর বেশি দূর যায়নি–সমারোপিত-নায়িকানায়কব্যবহারয়োর্নিশাশশিনোরেব বাক্যর্থত্বাৎ। নায়ক-নায়িকা-ব্যবহারের যে ব্যঞ্জনা, সেটি বাচার্থেরই বৈচিত্র্য সম্পাদক মাত্র।

দ্বিতীয় অলংকারটি হচ্ছে সংকরালংকার। ওর নাম সংকর; কারণ, ওতে একাধিক অলংকার মিশ্রিত থাকে। যেমন এক অলংকারের প্রয়োগ হয়, কিন্তু সেটি আবার অন্য একটি অলংকরকে সুচিত করে। লোচনকার অভিনবগুপ্ত কুমারসম্ভবের একটা বিখ্যাত শ্লোক উদাহরণ দিয়েছেন–

প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততে গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ ॥

‘বায়ুকম্পিত নীলপদ্মের মতো সেই আয়তলোচনার চঞ্চল দৃষ্টি, সে কি হরিণীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে, না, হরিণীরাই তার কাছে গ্রহণ করেছে, তা সংশয়ের কথা।’ এখানে বক্তব্য হল–যৌবনারূঢ়া পার্বতীর দৃষ্টি হরিণীর দৃষ্টির মতো চঞ্চল। কিন্তু এই উপমাটি স্পষ্ট না বলে একটি সন্দেহ দিয়ে তাকে প্রকাশ করা হয়েছে। এরকম কবিকল্পিত সংশয়কে আলংকারিকেরা বলেন সন্দেহালংকার। সুতরাং এখানে বাচ্য হল সন্দেহালংকার, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা হচ্ছে একটি উপমা। কিন্তু এ ব্যঞ্জনা ‘ধ্বনি’ নয়। কারণ, এ কবিতার যেটুকু মাধুর্য, তা ওই ব্যঞ্জিত উপমার মধ্যে নেই, ব্যক্ত সন্দেহের মধ্যেই রয়েছে। উপমাটি বরং ওই সন্দেহের অভ্যুত্থানের সহায়তা করে তার সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে, সন্দেহেই পর্যবসিত হয়েছে।

অত্র মৃগাঙ্গনাবলোকনেন তদবিলোকনসোপমা যদ্যপি ব্যঙ্গা, তথাপি বাচ্যস্য সা সন্দেহলাংকারস্যভুত্থানকারিণীত্বেনানুগ্রহকত্বাব্দ গুণীভুত। অনুগ্রাহ্যত্বে তর্হি সন্দেহে পর্যবসানম।'

অর্থাৎ, অভিনবগুপ্তের মতে মহাকবির এই বিখ্যাত কবিতাটি শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়, বর্ণনাকৌশলে মনোহারী মাত্র।

সমাসোক্তি ও সংকরালংকারে যে ব্যঞ্জনা থাকে, সে ব্যঞ্জনা যে কাব্যের আত্মা 'ধ্বনি'' নয়, এ বিচারের উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, বাক্যে যে-কোনও ব্যঞ্জনা থাকলেই তা কাব্য হয়। না। বিশ্বনাথ অবশ্য সাোজাসুজি বলেছেন, তা হলে প্রহেলিকাও কাব্য হত। কিন্তু এই সব অলংকার প্রযুক্ত হলে, তাদের কৌশল ও মাধুর্য তাদের ব্যঞ্জনাকে 'ধ্বনি' বলে ভ্রম জন্মাতে পারে, এইজন্য এদের সম্বন্ধেই বিশেষ করে সাবধান করা প্রয়োজন। সমাসোক্তিতে যে ব্যঞ্জনা, তা হচ্ছে এক বস্তুর বর্ণনা দিয়ে অন্য বস্তুর ব্যঞ্জনা। সংকরালংকারের ব্যঞ্জনা এক অলংকার দিয়ে অন্য অলংকারের ব্যঞ্জনা। সুতরাং যেখানে শব্দার্থ কেবলমাত্র বস্তু বা অলংকারের ব্যঞ্জনা করে, সে ব্যঞ্জনা শ্রেষ্ঠ কাব্যের 'ধ্বনি' বা ব্যঞ্জনা নয়। যে 'ধ্বনি' কাব্যের আত্মা, তার ব্যঞ্জনা কাব্যের বাচার্থকে বস্তু ও অলংকারের অতীত এক ভিন্ন লোকে পৌঁছে দেয়।

কাব্য তার বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায়, মহাকবির কথা কথার অতীত লোকে পাঠককে নিয়ে যায়—-এ-সব উক্তি যেমন একালের, তেমনি সেকালের বস্তুতান্ত্রিক লোকের কাছে হেঁয়ালি বলেই মনে হয়েছে। প্রাচীন বস্তুতান্ত্রিকেরা বলেছেন– কাব্যের বাচ্যও নয়, তার গুণ-অলংকারও নয়, অথচ 'ধ্বনি' বলে অপূর্ব এক বস্তু, এ আবার কী। ও-জিনিস হয় কাব্যের শোভা, তার গুণ ও অলংকারের মধ্যেই আছে, নয়তো ও কিছুই নয়, একটা প্রবাদ মাত্র; খুব সম্ভব শব্দ ও অর্থের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রসিদ্ধ। আলংকারিকেরা বর্ণনা করেননি

এমন একটি বৈচিত্র্যাকে একজন বলেছে ‘ধ্বনি’, আর আমনি একদল লোক অলীক সহৃদয়ত্বভাবনায় মুকুলিতচক্ষু হয়ে ‘ধ্বনি’ ‘ধ্বনি’ বলে নৃত্য আরম্ভ করেছে—

কিং চ বাগবিকল্পনামানন্ত্যাৎ সংভবত্যপি বা কস্মিংশ্চিৎ কাব্যলক্ষণ-
বিধায়িভিঃ প্রসিদ্ধৈর প্রদর্শিতে প্রকারলেশে ধ্বনিধর্বনিরিতি তদলীক
সহৃদয়ত্বভাবনা মুকুলিতলোচনৈর্ম্মত্যতে। তস্মাৎ প্রবাদমাত্রং ধ্বনিঃ।।

ধ্বনিবাদের মুখ্যাচার্য আনন্দবর্ধন তার ধ্বন্যালোক গ্রন্থে মনোরথ নামে এক সমসাময়িক কবির বাক্য তুলেছেন, যা নিশ্চয়ই একালের বস্তুতান্ত্রিকদের মনোরথ পূর্ণ করবে–

যস্মিন্নাস্তি ন বস্তু কিঞ্চন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি
বুৎপন্নে রচিতং চ নৈব বচনৈর্বাক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ।
কাব্যং তদ ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসন জড়ো
নো বিম্মোহভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ ॥

‘যে কবিতায় সুষমাময় মনোরম বস্তু কিছু নেই, চতুর বচনবিন্যাসে যা রচিত নয় এবং অর্থ যার অলংকারহীন, জড়বুদ্ধি লোকেরা গতানুগতিকের গ্রীতিতে (অর্থাৎ ফ্যাশানের খাতিরে) তাকেই ধ্বনিযুক্ত কাব্য বলে প্রশংসা করে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের কাছে ‘ধ্বনি’র স্বরূপ কেউ ব্যাখ্যা করেছে, এ তো জানা যায় না।’

এ সমালোচনায় ধ্বনিবাদীরা বিচলিত হননি। তাঁরা স্বীকার করেছেন কাব্যের ‘ধ্বনি’, তার বাচ্যার্থের মতো এত স্পষ্ট জিনিস নয় যে, ব্যাকরণ ও অভিধানে বুৎপত্তি থাকলেই তার প্রতীতি হবে। কিন্তু তাঁরা বলেছেন, যার কিছুমাত্র

কাব্যবোধ আছে, তাকেই হাতেকলমে প্রমাণ করে দেখানো যায় যে, কাব্যের আত্মা হচ্ছে ‘ধ্বনি’, বাচ্যাতিরিক্ত এক বিশেষ বস্তুর ব্যঞ্জনা। কারণ, বাচ্য বা বক্তব্য এক হলেও এই ‘ধ্বনির অভাবে এক বাক্য কাব্য নয়, আর ‘ধ্বনি’ আছে বলে অন্য বাক্য শ্রেষ্ঠ কাব্য, এ সহজেই দেখানো যায়। ধ্বনিবাদীদের অনুসরণে দু’-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

‘বিবাহ প্রসঙ্গে বরের কথায় কুমারীরা লজ্জানতমুখী হলেও পুলকোদগমে তাদের অন্তরের স্পাহা সূচিত হয়–এই তথ্যটি নিম্নের শ্লোকে বলা হয়েছে—

কৃতে বরকথালাপে কুমার্যঃ পুলকোদগমৈঃ।
সূচয়ন্তি স্পাহামন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ ॥

কোনও কাব্যরসিক এ শ্লোককে কাব্য বলবে না। ঠিক ওই কথাই কালিদাস পার্বতীর সম্বন্ধে কুমারসম্ভবে বলেছেন, যেখানে নারদ মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে হিমালয়ের কাছে এসেছেন–

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণিয়ামাস পার্বতী।

এর কাব্যত্ব সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন তুলবে না। কিন্তু কেন? কোথায় এর কাব্যত্ব? এর যা বাচার্থ, তা তো পূর্বের শ্লোকের সঙ্গে এক। কোনও অলংকারের সুষমায় এ কাব্য নয়; কারণ কোনও অলংকারই এতে নেই। ধ্বনিবাদীরা বলেন, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এ কবিতার শব্দার্থ, লীলাকমলের পত্রগণনা— তার বাচার্থ ছাড়িয়ে অর্থান্তরের–পূর্বরাগের লজ্জাকে ব্যঞ্জনা করছে; এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব।

অত্র হি লীলাকমলপত্রগণনমুপসর্জনীকৃতস্বরূপং.. অর্থান্তরং
ব্যভিচারিভাবলক্ষণং প্রকাশয়তি।

নারীর সৌন্দর্যের উপমান যে জল স্থল আকাশের সর্বত্র খুঁজতে হয়, এ একটি অতিসাধারণ কবিপ্রসিদ্ধি। নিম্নের শ্লোকে সেই ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছে।

শশিবদনাসিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম।
গগনজলস্থলসংভবহৃদ্যাকারা কৃতা বিধিনা।

‘আকাশের চন্দ্রের মতো মুখ, নীলপদ্মের মতো চক্ষু, শুভ্র কুন্দকুলের মতো দশনপঙক্তি— গগনে জলে স্থলে হৃদ্য যা-কিছু আছে, তার আকার দিয়ে বিধাতা তাকে নির্মাণ করেছেন।’ এ কবিতাকে কাব্য বলা চলে কি না, সে সংশয় স্বাভাবিক। কিন্তু ওই কবিপ্রসিদ্ধিকেই আশ্রয় করে কালিদাস যখন প্রবাসী যক্ষকে দিয়ে বলিয়েছেন–

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
গণ্ডচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বহভারেষু কেশান।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রবিলাসান
হন্তৈকস্মিন কচিদপি ন তে ভীরু সাদৃশ্যমস্তি।

তখন তাতে কাব্যত্ব এল কোথা থেকে? ধ্বনিবাদীরা বলেন, অলংকারগুলি তাদের অলংকারিত্বের সীমা ছাড়িয়ে প্রবাসীর বিরহব্যাথাকে ব্যঞ্জনা করছে বলেই এ কবিতা শ্রেষ্ঠ কাব্য। এর বাচ্য কতকগুলি উপমা, কিন্তু এর ‘ধ্বনি।’ প্রিয়াবিরহীর অন্তর-ব্যথা। এবং সেখানেই এর কাব্যত্ব।

মদনের দেহ ভস্ম হয়েছে, কিন্তু তার প্রভাব সমস্ত বিশ্বময়–এই ভাব নিম্নের কবিতা দুটিতে বলা হয়েছে।

স একস্ত্রীণি জয়তি জগন্তি কুসুমায়ধঃ।
হরতাপি তনুং যস্য শম্ভুনা ন হৃতং বলম।

‘সেই এক কুসুমায়ুধ তিন লোক জয় করে। শম্ভু তার দেহ হরণ করেছেন, কিন্তু বলা হরণ করতে পারেননি।’

কর্পূর ইব দগ্ধোহপি শক্তিমান যে জনে জনে।
নমোহস্তুবার্যবীর্যায় তস্মৈ কুসুমধাম্বনে ॥

‘দগ্ধ হলেও কর্পূরের মতো প্রতিজনকে তার গুণ জানাচ্ছে, অবার্যবীর্য সেই কুসুমধনু মদনকে নমস্কার।’

অভিনবগুপ্ত বলেছেন। (১।১৩)–এ কবিতা-দুটিতে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা না থাকায় এরা কাব্য নয়। প্রথম কবিতাটি এই ভাবমাত্র প্রকাশ করেই শেষ হয়েছে যে, মদনের শক্তির কারণ অচিন্ত্য–ইয়ং চাচিন্ত্যনিমিত্তেতি নস্যাং ব্যঙ্গ্যস্য সদ্ভাবঃ। দ্বিতীয়টি কর্পরের স্বভাবের সঙ্গে মদনের স্বভাবের তুলনাতেই পর্যবসিত হয়েছে— বস্তুস্বভাবমাত্রত্বে পর্যবসানমিতি তত্রাপি ন ব্যঙ্গ্যসম্ভাবশঙ্কা। কিন্তু ঠিক এই কথাই রবীন্দ্রনাথের ‘মদনভস্মের পর’ কবিতায় কাব্য হয়ে উঠেছে

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী!
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

অভিনবগুপ্ত নিশ্চয় বলতেন, তার কারণ এ কবিতার কথা তার বাচ্যকে ছাড়িয়ে, মানব-মনের যে চিরন্তন বিরহ, যা মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে, তারই ব্যঞ্জনা করছে। এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব। অভিনবগুপ্ত অবশ্য ঠিক এ ভাষা ব্যবহার করতেন না, কিন্তু ওই একই কথা তিনি তার আলংকারিকের ভাষায় বলতেন যে, এ কবিতার কাব্যত্ব হচ্ছে এর করুণ বিপ্রলম্ভের ধ্বনি'।

এই যে তিনটি উদাহরণেই দেখা গেল কাব্যের আত্মা হচ্ছে তার বাচ্য নয়, 'ব্যঞ্জন', কথা নয়, 'ধ্বনি'–এ ব্যঞ্জনা কীসের ব্যঞ্জনা, এ ধ্বনি কীসের ধ্বনি? ধ্বনিবাদীদের উত্তর'রস'-এর। তাঁরা দেখিয়েছেন, বাক্য যদি মাত্র কেবল বস্তু বা অলংকারের ব্যঞ্জনা করে, তবে তা কাব্য হয় না। রাসের ব্যঞ্জনাই বাক্যকে কাব্য করে। কাব্যের 'ধ্বনি' হচ্ছে রসের ধ্বনি। তিনটি উদাহরণেই কবিতার বাচ্য রসের ব্যঞ্জনা করছে বলেই তা কাব্য। এই রসের যোগেই পরিচিত সাধারণ কথা নবীনত্ব লাভ করে কাব্যে পরিণত হয়েছে।

দৃষ্টপূর্ব অপি হ্যর্থঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ।'

'পূর্বপরিচিত অর্থও রসের যোগে কাব্যত্ব লাভ করে বসন্তের নবকিশলয়খচিত বৃক্ষের মতো নূতন বলে প্রতীয়মান হয়।' অর্থাৎ কাব্যের আত্মা 'ধ্বনি' বলে যাঁরা আরম্ভ করেছেন, কাব্যের আত্মা 'রস' বলে তাঁরা উপসংহার করেছেন। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম।' কাব্য হচ্ছে সেই বাক্য, 'রস' যার আত্মা।

কোহয়ং রসঃ। এ রস’ জিনিসটি আবার কী?

পাঠকেরা যদি ইতিমধ্যেই নিতান্ত বিরস না হয়ে থাকেন, তবে পরের প্রস্তাবে প্রাচীন আলংকারিকদের রসবিচারের পরিচয় পাবেন। লেখকের মতে কাব্য সম্বন্ধে তার চেয়ে খাঁটি কথা কোনও দেশে, কোনও কালে, আর কেউ বলেনি।